OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 130 - 138
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 130 - 138
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সংগ্রাম ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর : মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্পে অন্ত্যজ ও আদিবাসী নারী

সরলা মাণ্ডি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নেতাজী মহাবিদ্যালয়
Email ID: saralamandiwbsu@gmail.com
0009-0000-1744-8619

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Sexual Exploitation, Suppression, Deprivation, Remonstrate, Tribe Society, Subaltern, Cultural.

Abstract
Mahashweta Devi was one of the gratest noveliest and fiction writers of Bengali language of the twentieth century. She emerged in Bengali literature in 1956 by writing 'Jhasir rani' an autobiographical fiction. she was also known to be social worker. In most of her short stories, she mentioned the lives of the Adivasi communities and marginalized sections of society, such as the Bagdi, Dom, Pakhamara, Ganju, Mal, Khariya Bauri, Lodha and others. She observed them very closely and spent a lot of time with them. Based on her real-life experience, she created many remarkable literary works by portraying the social lives of marginalized communities through the representation of various ethnic groups in different contexts. In most of her stories, she has unveiled an alternative history to develop the mental consciousness of inner struggles. In her short stories, we find many tribal and lower-class female characters who constantly protested against their social and sexual exploitation and deprivation. In her story 'Draupadi', 'Shikar' we draw up the main protagonist two tribal character who protest against their sexual exploitation. But in her story 'Bayen', 'Rudali', 'Dhouli', she raises a question about social degradation in relation to marginalized women. In these narratives, we encounter three central female characters who fall victim to the social exploitation of the upper castes in the form of sexual violence or oppression. This is the thrust of this article.

Discussion

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নামক সাহিত্য প্রকরণটির সুত্রপাত হয়। তাঁর হাত দিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণির উপর উচ্চবর্ণের শোষণকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু গল্প উঠে এসেছে। কিন্তু তাঁর গল্পে সজীব অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্র নেই বললেই চলে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের হাত ধরে বাংলা কথাসাহিত্যে এসেছে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের কথা। সম্ভবত বাংলা ছোটগল্পে প্রথম অন্ত্যজ শ্রেণির উপর লেখেছেন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মা' (১৩৩০) গল্পে, সেখানে তিনি এক সাঁওতাল যুবকের কুলি মজুরে পরিণত হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের থেকে দুই দশক পরে 'ঝাঁসির রাণী' (১৯৫৬) নামক ইতিহাসাশ্রয়ী জীবনী গ্রন্থ লেখে বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবীর আবির্ভাব। ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে এসেছে নানা বৈচিত্রের সমাহার। মোটামুটি ষাটের দশকের আগে পর্যন্ত; বাংলা সাহিত্য জগতে পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত মেয়েরা গল্প-উপন্যাস নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে তাদের মানসিক টানাপড়েন। ষাটের দশকের পর সত্তর দশকে নারীকেন্দ্রিক আলোচনার অনেক পরিবর্তন হয় বাংলা সাহিত্যে। এখানে নারীকে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপনের আকাঙ্খা লক্ষ্য করা হয়েছে এবং আরোও গভীরভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে সমাজজীবনের বিশেষ বিশেষ গতি পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীতে মধ্যবিত্ত মেয়েদের পাশাপাশি আলোচিত হতে লাগল বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতি, বিভিন্ন শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম ও দারিদ্র সীমার নীচে থাকা নারীদের কথা। এখানে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানান প্রেক্ষিতকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ধারণার প্রেক্ষিত শুরু হয়েছিল মানিক বন্দোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের (ডাইনি, ১৯৭৩) রচনার মধ্য দিয়ে। এই ধরণের লেখাগুলো মহাশ্বেতা দেবীর কাছে অন্য মাত্রায় ধরা দিয়েছে। তাঁর রচনার মধ্যে দেখা যায় নারীদের আর্তি ও আকাঙ্খা। মহাশ্বেতা দেবীর মতো আরো যেসব লেখিকার কাছে নারীর বুদ্ধি, সাহস, প্রেমানুভূতি, প্রেমাকাঙ্খা ধরা দিয়েছে, তাঁদের থেকে কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন অন্যরকম।

তাঁর কথাসাহিত্যে ইতিহাস চেতনা থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাপন, আদিবাসী শোষণ ও বিদ্রোহ, কৃষকদের ভাগচাষী, বর্গাচাষী, ভূমি আন্দোলন ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে। তাছাড়া তাঁর কথাসাহিত্যে নারীদের আলোচনার মধ্যে অন্ত্যজ শ্রেণীর কথায় বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তাদের বাস্তব জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা সামনে রেখে তিনি সাহিত্যে পথচলা শুরু করেন। তিনি অন্ত্যজ পিছিয়ে পড়া মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে থেকে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস রচনার সংখ্যা অগণিত। তিনি উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্পগুলিতে অন্ত্যজ ও আদিবাসী নারীদের জীবন যন্ত্রণার কথা, যেখানে তারা নানাভাবে শোষিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত অত্যাচারিত হয়েছে তাদের কথাগুলো সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। ফলে তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে আদিবাসী নারীদের ভূমিকা অনবদ্য। এখানে আমি আমার আলোচনার বিষয় হিসেবে তাঁর বেশ কয়েকটি ছোটগল্প বেছে নিয়েছি। যেমন – দ্রোপদী (১৯৭৩), 'শিকার' (১৯৭৮), 'বাঁয়েন', 'রুদালী' ও ধৌলী। এই গল্পগুলিতে নারীরা যেমন শোষিত হয়েছে, তেমনেই সমাজের কাছে রেখে গেছে নীরব ও সরব প্রতিবাদ।

তাঁর ছোটগল্প রচনায় গল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে আদিবাসী সমাজে কিভাবে এসেছে, সে সম্পর্কে মধুরিমা চক্রবর্তীর দেওয়া এক সাক্ষাতকারে মহাশ্বেতা দেবী বলেন –

> "আমি বলতে চাই না শুরুতে আদিবাসী সমাজ নিয়ে লিখতে চেয়েছি। আমি দীর্ঘদিন ধরে গল্প লিখছিলাম, যেগুলোতে নিয়ে কিছু ছিল না। এক সময় অগোচরে থাকা আদিবাসীদের সম্পর্কে জানতে শুরু করি, তখন আমি তাদের নিয়ে গল্প লিখতে বাধ্য হলাম। সেখানে ছিল চুনি কোটাল, লোধা সম্প্রদায়ের নারী যিনি। এই নারী ছিল লোধা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট। শিক্ষা অর্জনের পথে তার একটা ভয়াবহ গল্প ছিল। যখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল ক্লাসে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তার শিক্ষক হাজিরা খাতায় তাকে অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করত। তাকে বলা হতো যে তোমরা অপরাধপ্রবণ গোত্রের এবং শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সে রাখে না। সে আরেকজন লোধা ভদ্রলোককে ভালবাসত। তারা বিয়ে করেছিল কিন্তু একসঙ্গে থাকতে পারত না কারণ তার স্বামীর চাকরির কারণে। একদিন সে বাড়ি ফিরে এসে দেখে স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে। কারণ সে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। এসব আদিবাসী গোত্রদের সঙ্গে সব সময়ই হয়ে থাকে। আমরা জানি না এসব ঘটে এসেছে। তখন আমি এসব কাহিনি লিখিলাম। এটাই আসলে একমাত্র জিনিস, যেটা আমি জানি কিভাবে সেটা করতে হয়। আমি বেশি কিছু করতে পারিনি এবং সেখানে এখনো অনেক কাহিনী আছে, যেগুলো আমি লিখতে চাই।"[১]

যদি আমরা তাঁর ছোটগল্পগুলি বিচার করে দেখি তাহলে দেখা যাবে গল্পের প্রেক্ষাপটে কোন না কোন বাস্তব সত্য ঘটনা লুকিয়ে আছে। এই সমস্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে গল্পের প্রত্যেকটি পর্বে মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী অন্ত্যজ নারীদের আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর গল্পগুলোর মধ্যে এক অন্যতম গল্প হল 'দ্রোপদী'। এটি নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। এর কাহিনি আখ্যান বিস্তৃত হয়েছে আদিবাসীদের জীবনে নানা বঞ্চনা, সংস্কার এবং গৌরবময় দিক নিয়ে। আইভি রহমানকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে মহাশ্বেতা দেবী 'দ্রোপদী' গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন –

> "দ্রোপদী গল্প এক বিশেষ একটা আন্দোলনের কথা নিয়ে লিখেছি। ৭০এর দশকে বিশেষ একটা জায়গায় আদিবাসীদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাদের জায়গা জমি সব যাচ্ছিল, সমস্ত জিনিসটাই একটা প্রতিবাদ মূলক পটভূমি তৈরী করেছিল, দ্রোপদী যখন উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে তখন কিন্তু চরম একটা চপেটাঘাত সমাজের মুখেই পড়ে তাই না? গল্পের শেষে সেনানায়ক কিন্তু একেবারেই পরাজিত। তারা শুধু একটা মেয়েকে উলঙ্গ করতে পারে- লালসা চরিতার্থ করতে পারে কিন্তু সন্মান দিতে পারেনা। কিন্তু দেখো এই ঘটনার পর সমাজের মানুষ কিন্তু দ্রোপদীকেই সন্মান করে তাইনা? এই সন্মান দ্রোপদী আদায় করে নিয়েছে। আমি চাই সমাজের দ্রোপদীরা সবাই এই ভাবেই জেগে উঠুক। কেড়ে নিক তাদের প্রাপ্য। পরাজিত হয়ে যাক ওই সব সেনানায়ক সব সমাজেই।"[২]

এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্রোপদী, সে হচ্ছে সাঁওতাল উপজাতি বিদ্রোহের প্রতিনিধি এবং মহাজন শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হচ্ছে সূর্য সাহু। ছেলেকে খুন করার অপরাধে সমস্ত পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ও পুলিশের ক্যাপ্টেন অর্জন সিং এর কাছে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' হয়ে যায়; দ্রোপদী মেঝেন ও তার স্বামী দুলন। গল্পে আমরা দেখি তুই তকমাধারী পুলিশ ইউনিফর্মের সংলাপে দ্রোপদী সম্পর্কে জানা যায় -

> "মোস্ট নোটেরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওআন্‌টেড ইন মেনি...।"[৩]

১৯৭১ সালের ক্যাপ্টেন অর্জন সিং এর প্রতিনিধিত্বে যৌথ বাহিনীর 'বাকুলি অপারেশনে' পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় দ্রোপদী ও তার স্বামী। তাই পুলিশের কাছে দ্রোপদী ও দুলন কুখ্যাত অপরাধী রূপে গন্য হয়। পরবর্তীতে নিজের স্বজাতি দুঃখীরামের বিশ্বাসঘাতকতায় দুলন মাঝির পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়। তারপর দ্রোপদী একাই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। একসময় দ্রোপদীর সহকর্মী সোমাই ও বুধনা প্রলোভনের পথে পা বাড়ায় এবং তারা দ্রোপদীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফলে সে বেশিদিন আত্মগোপন করে থাকতে পারেনি। একসময় দ্রোপদী পুলিশের ফাঁদে ধরা পড়ে। তারপর সেনানায়কের নির্দেশে দ্রোপদী মেঝেনের উপর শুরু হয় নানা অমানুষিক যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ। কারণ সেনানায়ক নির্দেশ দিয়েছেন –

> "ওকে বানিয়ে নিয়ে এসো। ডু দি নীডফুল।"[৪]

সেনানায়কের কথামতো তারা দ্রোপদীকে বানিয়ে নিয়ে এসেছে সেনাগন –

> "তারপর নিযুত এক চাঁদ কেটে যায়।এক নিযুত চান্দ্র বৎসর লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রোপদী চোখ খুলে কি বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলপিনের মাথা সরে যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনো ওর দু'হাত দু'খুঁটোয় এবং দু'পা দু'খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নিচে চটচটে কি যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভিতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা। পাছে'জল' বলে ওঠে, সেই ভয়ে ও দাঁতে নীচের ঠোঁট চাপে। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্ত স্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিলো?"[৫]

গল্পে দ্রোপদী জোতদার, মহাজন, শোষক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আদিবাসীদের এক সত্তা। দ্রোপদী একঘণ্টা ধরে অমানবিক যৌন নির্যাতন ও ধর্ষিত হবার পরেও বিদ্রোহী দ্রোপদীকে দমিয়ে রাখা যায় নি। ধর্ষিত উলঙ্গ দ্রোপদী আরও বীভৎস হয়ে ওঠে সেনানায়কের কাছে। দ্রোপদীর প্রতিবাদের সামনে সেনানায়কও ভীত হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন –

> "দ্রোপদীর কালো শরীর আরোও কাছে আসে। দ্রোপদীর দুর্বোধ্য, সেনা নায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 130 - 138
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> চেটোতে মুছে ফেলে দ্রোপদী কুলকুলি দেবার মত ভীষণ, আকাশচেরা; তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কী হবে, কাপড়? ল্যাংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু? চারদিক চেয়ে দ্রোপদী রক্তমাখা থুতু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুতু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কী করবি? লেঃ কাউন্টার কর্, লেঃ কাঁউটার কর্? দ্রোপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।”[৬]

প্রতিবাদ যদি সবাক বা নির্বাক কিংবা নিরুচ্চার যাইহোক না কেন তা শাসক দলের সামনে অবশ্যই মারাত্মক ভয়ের। এই প্রতিবাদের মাধ্যমেই নির্মুল হয় শোষণ ও শোষণকারীর রাজপ্রাসাদ। দ্রোপদী গল্পের এই উলঙ্গ দ্রোপদীই সোচ্চার প্রতিবাদ করেছে। গল্পকার ‘দ্রোপদী’ গল্পের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন নারীর চিরন্তন দুর্বলতা ও শক্তির আধার হল তার নারীত্ব। তিনি এই নারীত্বকে বিভিন্ন ভাবে উপস্থান করেছেন তাঁর সাহিত্যে। এখানে গল্পকারা নারীর নগ্নতাকে তার শক্তির আধার হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সমস্ত বাংলা সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি আদিবাসী নারী দ্রোপদী।

‘শিকার’ মহাশ্বেতা দেবীর আর একটি অন্যতম গল্প হল। গল্পটিতে আমরা ওঁরাও আদিবাসী সমাজের নারীর কথা পাই। গল্পে নারীদের প্রতি সমাজের নানান অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এবং সমাজে নারীদের প্রতি পুরুষের বৈষম্য মূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও পাওয়া যায়। গল্পের প্রধান নারী চরিত্র মেরী। মেরীর স্বাজত্যবোধ, কর্মদক্ষতা সজীব। আমরা দেখি যে উচ্চবিত্ত সমাজের পুরুষরা সম্ভোগলিপ্সু পূরণের জন্য অন্ত্যজ সমাজের নারীদেরকে ব্যবহার করে থাকে। এই পরিস্থিতিতে মেরীকেও পড়তে হয়েছে। তসিলদার তাকে ভোগ করতে চেয়েছিল। এমনই পরিস্থিতিতে আমরা মেরীকে প্রতিস্পর্ধী রূপে পাই –

> “তসিলদার তাঁবুতে বসে মেয়ে মরদকে পয়সা দিচ্ছিল। প্রচুর মানুষের ভিড়। তারই মধ্যে মেরী ঢুকে পড়ে ও জঘন্য গাল দিয়ে কাপড়টা ছুঁড়ে দেয়। বলে, শহরের রাণ্ডী পেয়েছিস আমাকে। কাপড় দিয়ে ভোলাতে এসেছিস? ফের বদমাসি করবি তো নাক কেটে দেয়। হাত দুলিয়ে ও বেরিয়ে যায় ও সগর্বে।”[৭]

গল্পে দেখা যায় যে উচ্চবিত্ত মানুষরা অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের শরীরকে কিনতে চেয়েছিল। মেরী তা ভেঙে চুরমার করে দেয়। অনেকে মেরীর কাছে অবৈধ আবদারের জন্য এসেছিল। কিন্তু মেরী তা না করেছে। এই প্রসঙ্গে মেরী যা বলেছিল –

> “তারা বাইরের মানুষ। ভিক্‌নির মতো, তাকেও ওরা পেটে বাচ্চা দিয়ে পালাবে না, কে কথা দিতে পারে।”[৮]

এই বাক্যের মাধ্যমেই মেরীর নারী সচেতনতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। মেরীর যে কতটা বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান আছে তার এই বক্তব্যই প্রকাশ হয়ে ওঠে। গল্পকার বলেছেন মেরীর ভক্তবৃন্দের অভাব নেই তোহ্‌রি বাজারে। যখন সে ট্রেন থেকে নামে তখন তাকে রাণীর মতো মনে হয়। বাজারে সবাই তাকে চেনে এবং সেখানে নাম ডাকও আছে তার। সে বাজারে জায়গা করে নিয়েছে। মেরী পুরুষদের কাছ থেকে বিড়ি, সিগারেট চেয়ে চেয়ে খায় কিন্তু কাউকে পাত্তা দেয় না। মেরী অনেক নেতা ও তাদের সন্তানের প্রণয়ী। গল্পকার অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন –

> “মেরী ওঁরাও যখন এসে দাঁড়ায়, তখন সে যেমন ট্রেনটিকে দেখে, যাত্রীরাও চোখ পড়লে তাকে দেখে। বয়স আঠারো, দীর্ঘাঙ্গী, চ্যাপ্টা মুখ, নাক, রঙ তামাটে ফরসা। সাধারণত ও ছাপা শাড়ি পরে। দূর থেকে ওকে খুব মোহনীয় দেখায় কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায়, ওর চোখের ভাষায় খুব কঠিন প্রত্যাখ্যান আছে।”[৯]

গল্পের শেষে আমরা মেরীর স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারি। মেরীকে ভোগ করতে চেয়েছিল তসিলদার এবং সুযোগ বুঝে মেরীকে কব্জা করেও নিয়েছিল। মেরী তা অনুভব করতে পেরে বুদ্ধির জোরে তসিলদারের কাছ থেকে সে নিস্কৃতি পায়। সে তসিলদারেকে বলে হোলির দিনে সে নিজেকে সঁপে দেবে বলে; এই কথা বলে সে তসিলদারের কাছ থেকে চলে আসে। দু’জন দু’জনকে হোলির দিনে শিকার করার জন্য দিন গুনছিল। তাদের দু’জনের শিকার ছিল আলাদা আলাদা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 130 - 138
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গল্পে লেখিকা উল্লেখ করেছেন বারো বছর পর ওঁরাও সমাজে আজ পুরুষের পরিবর্তে মেয়েদের শিকারের দিন। এই দিনের রাত্রিতেই মেরী অভিসার করতে চেয়েছে। গল্পের প্রথম দিকে শিকারী তসিলদার আর শিকার মেরী মনে হলেও গল্পের শেষে দেখা যায় শিকার হল তশীলদার আর শিকারী হলো মেরী। দেখা যায় বহু প্রতীক্ষার পর অপেক্ষারত তসিলদার যখন দৈহিক মিলনের জন্য আনন্দে আত্মহারা তখনেই মেরীর দা এর কোঁপে তাকে নিধন হতে হয়েছে। এই মাংসলোলুপ মানুষবেশধারী পশু তশীলদারকে মেরীর মনে হয়েছে 'বড় শিকার'। তাই সে আনন্দিত হয়ে বলছে –

> "কয়েক লক্ষ চাঁদ কাটল। মেরী উঠে দাঁড়াল। রক্ত? জামায়? কাপড়ে? নালায় ধুয়ে নেবে... মেরী বেরিয়ে এলো। নালার দিকে চলল। নালায় নেমে নগ্ন হয়ে স্নান করতে ওর মুখ গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেল। যেন পুরুষসঙ্গ করে অশেষ তৃপ্তি পেয়েছে ও।"[১০]

নারী জাতির প্রতি অবমাননা ও মাংসলোলুপ পুরুষের প্রতি মেরীর এই প্রতিবাদ অবশ্যই আইনের চোখে অপরাধ। জীবন যেখানে বিপন্ন মনে হবে সেখানে প্রতিবাদ অবশ্যই থাকে, তা নীরব বা সরব প্রতিবাদেই হোক। গল্পে দেখা যায় সেই শিকার নিধন রাত্রিতেই ওঁরাও সমাজের মেয়েদের কণ্ঠে গানের মধ্যে উঠে এসেছে প্রতিবাদের সংকেত –

> "হে হরম্‌দেও,
> এমন হোলি বছর বছর হোক-
> এমন শিকার বছর বছর করি-
> মদ দিব তোমাকে
> মদ দিব-"[১১]

'শিকার' আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক আচার, শক্তি ও বেঁচে থাকার প্রতীক। 'শিকার' এখানে রুপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এখানে 'শিকার' নিছক পশু ধরার প্রথা নয়, বরং শোষিতের প্রতিবাদী প্রতিরোধ। গল্পে দেখা যায় নির্যাতক জমিদারকে মেরী নিজের শিকার বানায়। এখানে মেরী যে প্রতিরোধ করে তা প্রতীকীভাবে হয়ে ওঠে আদিবাসী নারীর মুক্তি ও শক্তির প্রকাশ। এতদিন ধরে যে শিকার করছিল সেই হয়ে ওঠে শিকারি। 'দ্রোপদী' গল্পের দ্রোপদী এবং 'শিকার' গল্পের মেরী এই দুই অন্ত্যজ আদিবাসী নারীর মধ্যে যে প্রতিবাদ দেখতে পাওয়া যায় তা কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর অন্যান্য গল্পে তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। তারা যেভাবে সমাজ বঞ্চনা ও অত্যাচারের শিকার হয়েছে। লেখিকা এখানে বোঝাতে চেয়েছেন আদিবাসী সমাজের ওপর রাষ্ট্র জমিদার ও শোষকের দমননীতি, নারী কেবল শোষণের শিকার নয়, বরং সে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের শক্তি ধারণ করে। শিকার প্রথার ভেতর আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও প্রতিবাদের ঐতিহাসিক ধারাকে উন্মোচিত করা। দীর্ঘকাল ধরে শোষিত নারী-আদিবাসীর ভেতর জমে থাকা ক্ষোভ একদিন বিস্ফারিত হয়ে শোষকের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

মহাশ্বেতা দেবীর 'রুদালী' গল্পটি বিষয় বৈচিত্রতার দিক থেকে এক অভিনব সৃষ্টি। মূলত 'রুদালী' শব্দটি বাংলা নয়। এর অর্থগত দিক আলোচনা করলে বোঝা যায় টাকা দিয়ে ভাগ করা পেশাজীবি সম্প্রদায়। এদের কাজ মৃতের বাড়িতে গিয়ে কান্নাকাটি করা। এই পেশাজীবি সম্প্রদায় মূলত রাজস্থানের অন্ত্যজ গোত্রের। এভাবে টাকা দিয়ে কান্নাকাটির জন্য নারী ভাড়া রাজস্থানে দেখা যায়। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শনিচরী। পেশায় সে ভাড়াটে কাঁদুনে, টাকার বিনিময়ে কান্নাকাটির এবং তার সাথে মৃতের বাড়িতে মৃতের সংস্কারের নানারকম কাজ করে থাকে। নিজের আত্মীয় পরিজন মারা গেলেও সে কান্নার সময় পায় না। তাই গল্পকার বলেছেন –

> "শাশুড়ি মরতে শনিচরী কাঁদেনি। ওর বর আর ভাশুর, শাশুড়ির দুই ছেলেকেই হাজতে পুরেছিল মালিক মহাজন রামাবতার সিং..., বুড়িকে দাহ করার ব্যবস্থা করতে শনিচরী এত ব্যস্ত ছিল যে কাঁদার সময় হয়নি। হয়নি তো হয়নি! বুড়ি যে জ্বালান জ্বালিয়ে গেছে, কাঁদলেও তো শনিচারীর আঁচল ভিজত না।"[১২]

শনিচরী ভালোভাবে জানে তাকে কাঁদতে হবে অন্যের বাড়িতে গিয়ে। তাতে তার আয় হবে এবং সংসারে অন্ন আসবে। সে জানে কান্না বিক্রি করেই তাঁকে বাঁচতে হবে। কেউ যদি মরে তবেই তার রোজগার হয়, বাঁচার রসদ পায়। তাই সে কিছু মানে না, পেটের জ্বালা বিষম জ্বালা। শনিচরীর স্বামী কলেরায় মারা গেছে। গল্পকার বলেছেন বধুয়ার বাপের জন্য তার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 130 - 138
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাঁদা সম্ভব হয়নি তার ব্যস্তময় জীবনে। পরে তাকে কাঁদতে দেখা যায়, এ কান্না কোন স্বজন হারানোর কান্না নয় বা কোন দুঃখের কান্না নয়। এ কান্না দু মুঠো অন্নের জন্য। কেবল যে কাঁদলেই টাকা পাওয়া যাবে তা নয়, কান্নারও অনেক ভাগ আছে।

গল্পকার 'রুদালী' গল্পে শোষক ও শোষিতর কথা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যেখানে শোষক শ্রেণি শোষিতকে নিংড়ে নেবে তার মধ্যে থাকা সমস্ত নির্যাসকে। আলোচ্য গল্পে দুসাদ নামক এক অন্ত্যজ শ্রেণির কথা আমরা পাই। এখানে শনিচরীই এই গল্পের অন্ত্যজ দুসাদ জাতির নারীর প্রতিরূপ। সেও দুসাদ জাতির পুরুষদের মতো একইভাবে শোষিত। শনিচরীও উচ্চবর্ণের রাজপুত মহাজনের হাতে শোষিত। স্বমীর মৃত্যুতে সে অসহায়। সমাজের উচ্চবর্ণের দ্বারা নির্মিত শ্রাদ্ধ শান্তি উপলক্ষে বাধ্য হয়ে মহাজন রামবতার সিং এর কাছ থেকে পাঁচ বছর ক্ষেত-বেগারি খেটে পঞ্চাশ টাকা শোধ করব এই শর্তে তাকে টাকা ধার করতে হয়। শনিচরীকে বেঠবেগারী হিসাবে খাটতে তার সমাজ ও দারিদ্র সমানভাবে দায়ী। শুধু শনিচরীই নয় এর স্বীকার হয়েছে তার ছোটবেলার সাথি বিখনি। সেও রাজপুত শাসিত সমাজে মহাজনদের দ্বারা শোষিত হয়ে তাকে নিঃস্ব হতে হয়েছে। কালের গতির আগমনে শনিচরীকে স্বামী ও ছেলেকে হারাতে হয়েছে। তার একমাত্র সহায়সম্বল ছিল তার নাতি। কিন্তু সেও শনিচারীকে ছেড়ে পালিয়ে যায় ম্যাজিসিয়ানের দলে। এরকম নিঃসহায় বৃদ্ধা শনিচরীর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে বাল্যকালের সাথি বিখনির। তারা দুজনেই জীবন সংগ্রামে সমানভাবে বিপর্যস্ত। এই রকম পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা দুজন দুলনের শরণাপন্ন হয়। দুলন তাদের দুজনকে বলে 'রুদালী' নামক এক পেশার কথা। আগেই আমরা আলোচনা করেছি রুদালী সম্পর্কে। রাজপুত সমাজে র কোন ব্যক্তি মারা গেলে রোদনের জন্য প্রয়োজন হয় রুদালীর। দুলনের কথায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে –

> "হাতি, ঘোড়া, মহিষবাথান, উপপত্নী, জরাজ সন্তান, উপদংশ বা অন্য যৌনব্যাধি – 'বন্ধুক যার জমি তার' বিশ্বাস সকলেরই অল্পবিস্তর আছে। ...এদের মানসন্মান রাখতে রুদালী ঔরত চাই।"[১৩]

তারা বিশ্বাস করে যে রুদালীর কান্না যত জোরে হবে, ততই রাজপুত মানুষের পার্থিব মহিমা কীর্তীত হয়। গল্পে আমরা দেখি অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা রাজপুত জাতির কাছে প্রবল শোষিত হয়েছিল। যেসব অন্ত্যজ শ্রেণির নারীরা সবচেয়ে বেশি শোষিত হয়েছিল তারা রাজপুত জাতির জারজ সন্তান প্রসব করেছিল। তাদের স্থান হয়েছে 'রাণ্ডী খানা' নামক নিষিদ্ধ স্থানে। তারাই জীবিকার প্রয়োজনে জীবন সংগ্রামে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য দেহব্যবসার পাশাপাশি রুদালী নামক পেশাকে বেছে নিয়েছিল। এই পেশা সভ্য সমাজে হাস্যকর হলেও এটাই বাস্তব। রাজপুতরা শত অত্যাচার করলেও, শত নারীকে রক্ষিতা করে জারজ সন্তান প্রসব করালেও, নারী পুরুষ উভয় বেঠবেগারী খাটলেও তারা কোন অপরাধে দণ্ডিত হয় না। আলোচ্য গল্পে আমরা দেখি শনিচরী ও ও বিখনি তারা দুজনেই এই পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। লেখিকা এই গল্পের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন সমাজে দারিদ্র পীড়িত ও নিম্নবর্গীয় নারীরা কেবল শ্রমশক্তি নয়, তাদের দুঃখ-শোকও শোষণের উপকরণ। ধনি-গরীব বিভাজন শুধু জীবদ্দশায় নয়, মৃত্যুর পরও বিদ্যমান। নারীর কান্না, বেদনা, শরীর সবকিছুই শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পে শ্রেণি শোষণ, নারীর দুঃখেরও বাণিজ্যিকরণ এবং সমাজের ভণ্ডামিকে নগ্নভাবে উন্মোচন করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর অন্য আর একটি গল্প 'বাঁয়েন'। গল্পকার গল্পের বিষয় বস্তুতে একটি মতবাদ দেখিয়েছেন। এই কাহিনীটি শুরু হয়েছে এক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে। এই গল্পের প্রধান নারী চরিত্র ডোম সমাজের অভিশপ্ত কুসংস্কারের 'চন্ডী'। গল্পের শুরুতেই গল্পকার চন্ডী বাঁয়েনের বর্তমান কালীন বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরেছেন তারই ছেলে ভগীরথের দৃষ্টিতে –

> "কখনো মনেও হয়নি চন্ডী বাঁয়েন কারো মা হতে পারে। দূর থেকে দেখেছে ঘরের মাথায় লাল নেকড়ের ধ্বজা, মাঝে মাঝে দেখেছে উত্ভ্রান্তের মতো ধানক্ষেতের আল ধরে চৈত্রের চষা দুপুরে লাল কাপড় পরে কে যেন কাঠি দিয়ে টিন বাজাতে বাজাতে মজা পুকুরের দিকে যাচ্ছে, পেছনে একটা কুকুর। বাঁয়েন যখন যায় তখন টি বাজিয়ে সাড়া দিতে দিতে যায়। বাঁয়েন যদি কোন ছোট ছেলে বা পুরুষকে দেখে, তখনি চোখের দৃষ্টিতে তাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিতে পারে।"[১৪]

অন্ত্যজ শ্রেণিরা চিরকালই অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণি বিভক্ত সমাজে কাছে। এই গল্পে ডোম অন্ত্যজ শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন। এই গল্পটি আবর্তিত হয়েছে চন্ডী নামক নারীকে কেন্দ্র করে। সে জাতিতে ডোম, এই গল্পে সে বাঁয়েন নামে পরিচিত। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে এরা নিন্ম বর্ণের। চন্ডীর বাঁয়েনের বিয়ে হয়েছিল ঐ গ্রামের স্বজাতি মলিন্দের সঙ্গে। পিতার কৌলিক বৃত্তি সূত্রে ভাগাড়ে শবদেহ সৎকারের কাজ করতে হয় চন্ডীকে। কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারছে না শ্রেণি বিভক্ত সমাজে ডোম সমাজের মানুষের সৎকারের কর্মকে কেন ঘৃণার চোখে দেখে? শবদেহ সৎকারের সূত্র ধরেই মলিন্দের সঙ্গে পরিচয় ও পরে তাদের বিয়ে হয়। সে এক সন্তানের মা হয়। কিন্তু একদিন ডোম সমাজের অন্ধ বিশ্বাসে হটাৎ সে চন্ডী বাঁয়েন হয়ে ওঠে। তাই গল্পকার বলেছেন–

> "চন্ডী হয়ে গেল বাঁয়েন, নিষ্ঠুর শিশু হন্তা।"[১৫]

আলোচ্য গল্পে গল্পকার সমাজ সচেতন বাস্তবতাকে দেখিয়েছেন। আমরা এখনও কখনও কখনও সংবাদপত্রে লক্ষ্য করি 'ডাইনি' অপবাদ দেওয়া। এর ফলে নারীর প্রতি এক কুসংস্কার বিরাজ করে এবং সমাজের নানান অত্যাচার, শোষণ, দেখা যায়। এই চন্ডীও শিশু হন্তারক হওয়ার পর তার বৈবাহিক জীবনে নেমে আসে অশান্তি এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। এরপর স্বামী, সন্তান ও পরিবার সমাজ থেকে তাড়িয়ে তাকে সমাজের লোক এক কোণে রেখে দেয়। চন্ডী হয়ে যায় আলাদা সমাজ বা জগতের মানুষ, নিয়ম শৃঙ্খলার বেড়ি তাকে পরিয়ে দিয়েছে সমাজ এবং তাকে স্বামী সন্তানের পরিচয় দিতেও বাধা দেওয়া হয়েছে। তাই তার ছেলে ভগীরথের জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত সে তার পরিচয় জানত না। ভগীরথ তার বাবার কাছ থেকে মায়ের পরিচয় জেনে তার হৃদয় বিচলিত হয়ে ওঠে। তার মা সমাজ স্বীকৃত বাঁয়েন হওয়া সত্ত্বেও মাতৃস্নেহের জন্য ভগীরথের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে আর চন্ডীরও ভগীরথকে দেখে তার মাতৃ স্নেহ জেগে ওঠেছে। সমাজের জন্য তাকে একদিন বলতে হয়েছিল -

> "ঘরে বন্‌শধর রইতে কেউ উ বাক্য মুখে ল্যায়? আমি বাঁয়েন? আমি ঘরের ছেলে ফেলে, মরা ছেলেকে দুধ দেই, মরা ছেলে লিয়ে সোহাগ করি? আমি বাঁয়েন?"[১৬]

কিন্তু এই বাঁয়েনেই একদিন মানব সমাজের কল্যাণ সাধণের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও রক্ষা করে 'ফাইভ আপ লালগোলা 'মেলকে বৃহত্তর ক্ষতি সাধনের হাত থেকে। বৃহত্তর মানব কল্যাণ চেতনার উন্মেষ, বিসর্জিত জীবন চন্ডীকে সমাজ ও পরিবারের প্রতি পুনরায় তাকে তার আসল পরিচয়ে আসল স্বীকৃতি ফিরিয়ে দিয়েছে। পরবর্তীতে অন্ধ বিশ্বাস কুসংস্কার বলতে বাধ্য হয়েছে চন্ডী তাদের সমাজের একজন। বিডিও লিখতে লাগলেন। গল্পের শেষে দেখা যায় –

> "ভগীরথের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল... ভগীরথ গলা ঝেড়ে বলল-আঞ্জা আমার নাম ভগীরথ গঙ্গাপুত্র। বাপ পূজ্য মলিন্দের গঙ্গাপুত্র। নিবাস ডোমপাড়া। মা ঈশ্বর চন্ডী গঙ্গাদাসী...।"[১৭]

এইভাবে ভগীরথ নিজের বংশ পরিচয় দিতে দেখা যায়। এখানে লেখিকা এক ব্যক্তি চৈতন্যে জাগরণের এক জীবন্ত উদাহরণ দিয়েছে সমাজকে। এভাবেও বাঁচা যায়। অন্যায় অত্যাচার, নিপীড়ন ইত্যাদি যুক্তিগ্রাহ্য পটভূমি নির্মান করেছেন লেখিকা। গল্পকার বার্তা দিয়েছেন এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কঠোর লড়াই করে বাঁচতে হবে। তিনি অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষদেরকে বোঝার চেষ্টা করেছেন।

এরপর আমরা দেখতে পাই 'ধৌলী' গল্পে উচ্চ বংশের বিরংসা এবং অন্ত্যজ দুসাদ শ্রেণির নারীর জীবন কাহিনী। যেখানে আমরা দেখতে পাই বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম-বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিছবি। এই গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র ধৌলী, এর নাম অনুসারে গল্পের নামকরণ করা হয়েছে। কাহিনীটির প্রেক্ষাপট মানভূম, ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন অঞ্চল। অন্ত্যজ শ্রেণি ভালোবেসেছিল উচ্চবর্ণের মিশ্রিলালকে। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে তাদের উচ্চ ও নিচ্চ বর্ণের এই বিভেদ সমাজ মানবে না এটা ধৌলী জানত। তবুও এই মিশ্রিলালের কথায় পা বাড়ায় এবং সে মিশ্রিলালের জৈবিক চাহিদা পূরণ করে ধৌলী গর্ভবতী হয়। মিশ্রিলাল সামাজিক পরিচয় দিতে চাইলেই; তার পরিবার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যারফলে এই অন্ত্যজ শ্রেণির নারীরা জরাজ সন্তান জন্ম দেয়। যেন সমাজের এক অলিখিত নিয়মে তারা অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের দেহসম্ভোগ করায় এবং অবৈধভাবে তারা অন্তঃসত্বা হয়, এটি নাকি তাদের অলিখিত নিয়ম। তারা অনেক নারীকে রাণ্ডী করে রাখে। গল্পে মিশ্রিলালের মায়ের কণ্ঠে অন্ত্যজ শ্রেণির নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে শোনা যায় –

"দুসাদ-গঞ্জু মেয়ের পেটে এ বংশের মরদদের ছেলে আগেও হয়েছে। বয়সের গরম তোর।"[১৮]

উচ্চবর্নের পুরুষদের অসংযত কামনা ও তার ফলাফল অন্ত্যজ নারীদের জীবন বিনষ্ট হয়ে যাওয়া ঘটনাকে উচ্চবর্নের নারীরা বয়সের গরম এর সুনির্দিষ্ট সঞ্জায় রাখতে চায়। এই কারণে মিশ্রিলালের মা ধৌলীকে মিশ্রিলালের স্ত্রী রূপে স্বীকার করতে চায়না। বরঞ্চ একজন খোরপোশ যুক্ত রক্ষিতা হিসেবেই দেখতে চায়। মিশ্রিলালের পরিবার কেউ ধৌলীকে স্বীকার করেনি। এরজন্য তারা মিশ্রিলালকে দূরে সরিয়ে রেখে তারা বিয়ে দেবার চেষ্টা করে তার। মিশ্রিলাল প্রথমে রাজি না হলেও পরবর্তীতে রাজী হয়ে যায়। এই সব কথা ধৌলী জানতে পারে তার জীবনে নেমে নেমে আসে এক অস্তিত্বের সংকট। তখন ধৌলী বলে –

> "ধৌলী সবই জানছিল। ও প্রতিবাদ জানাবার কথা ভুলেও ভাবেনি। দুসাদ মেয়েকে ব্রাক্ষনের ছেলে কি এই প্রথম নষ্ট করল? গ্রাম সমাজের বিছারে সব দোষেই ধৌলীর। এতে প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপার থাকায় ধৌলী স্বসমাজের কাছেও ব্রাত্য। স্বসমাজের ছেলেদের সে আমল দেয় নি। না দিক। মিশ্রিলাল ওকে জোর করে খাটিয়ে নষ্ট করলে দুসাদরা ওকে ফেলত না। মিশ্রিবাড়ির ছেলেদের জারজ সন্তান দুসাদ-গঞ্জু ধৌবি টলিতে অনেক থাকে। এক্ষেত্রে ধৌলী স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেছে। অমার্জনীয় অপরাধ।"[১৯]

সামাজিক স্বীকৃতি নয়, একজন রক্ষিতার জীবন যাপনের জন্য যতটা খোরপোষের দরকার ততটুকু প্রত্যাশা ছিল ধৌলীর। প্রথমদিকে মিশ্রিলাল ও তার পরিবার দিতে রাজি হলেও পরবর্তীতে তারা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। শুধু পরিবারের দিক থেকে নয় মিশ্রিলালের দিক থেকেও ধৌলীর প্রাপ্তি হয়েছে কপট। নিজের জীবন যুদ্ধে ধৌলী তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য দেহব্যবসায় নামতে বাধ্য হয়েছে। ধৌলির জীবনে একদিকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম অন্যদিকে নিজের সমাজের প্রতি অসহায়তা ধৌলীকে 'বেওসা রাণ্ডীতে' পরিণত করেছে। এরজন্য যতটা মিশ্রিলাল দায়ী তার থেকে বেশি দায়ী সমাজব্যবস্থা। লেখিকা এই গল্পে গ্রামীণ ক্ষমতাশীল শ্রেণি নিম্নবর্গের নারীকে পীড়ন করে এবং পুরো সমাজ নীরব দর্শক থাকে। এতে সামাজিক ন্যায়বোধ ও নৈতিকতা কোথায় দাঁড়িয়েছে – এ প্রশ্ন লেখিকা তুলে ধরেছেন। ধৌলী অপমান সহ্য করলেও শেষপর্যন্ত তার নীরবতা ভেঙে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। এই প্রতিবাদ লেখিকার চোখে সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রতীক। লেখিকা বোঝাতে চেয়েছেন যে, নারী কেবল শোষণের শিকার হয়ে থাকবে না; তার ভেতরেও বিদ্রোহের শক্তি আছে। গল্পে আমরা দেখি ধৌলীর মতো নারীর কণ্ঠস্বরেও সমাজের অমানবিক কাঠামো ভাঙার ইঙ্গিত বহন করেছে।

আমরা দেখি যে যুগ পরিবর্তনের পাশাপাশি পরিবর্তিত হয়েছে সমাজ সভ্যতা। একসময় দেখি নারীরা ছিল অন্ধকারের কানাগলিতে, পর্দার পিছনে, আজ তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে। নারীবাদ নামক শব্দটি যতই এগিয়ে যচ্ছে ততই নারী পুরুষের ক্ষময়াতন ততই মজবুত হচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে গড়ে উঠেছে নারী শোষণ, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইন, গঠন করেছে মহিলা কমিশন, নারী সমিতি। নারী শক্তির এই সকল শুভ প্রচেষ্টার অবদান অনস্বীকার্য। এই আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণির নারীরা আজ কোথায় দাঁড়িয়ে? একথায় বলতে গেলে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ছোটগল্পগুলিতে নারী চরিত্রের এক উপনিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রচিত গল্প গুলিতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন শক্তির বিরুদ্ধে অন্ত্যজ শ্রেণি প্রতিবাদী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। প্রভুতশালী সমাজ ব্যবস্থার শোষণের প্রতিবাদী রূপ হিসেবে প্রান্তিক অন্ত্যজ শ্রেণির কণ্ঠস্বরকে দেখিয়েছেন।

Reference:

১. চক্রবর্তী, মধুরিমা, '*লেখক সামাজিক দায়বদ্ধতা এড়াতে পারেন না- মহাশ্বেতা দেবী*', সাম্প্রতিক দেশকাল, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৭, বৃহস্পতিবার, ঢাকা, ৪ আগস্ট ২০১৬, ই - মাধ্যম। (মহাশ্বেতা দেবীর জীবদ্দশায় ২০১৩ সালে এই সাক্ষাৎকার মধুরিমা চক্রবর্তী নিয়েছিলেন। ইংরেজি থেকে এটি অনুবাদ করেছেন রাফসান গালিব।)

২. রহমান, আইভি, *মহাশ্বেতা দেবী'র সাথে এক সন্ধ্যা, এই দেশ পত্রিকা*, ঢাকা, ৫ই ফেব্রুয়ারি(বুধবার) ২০১৪, মুদ্রিত।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 14
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 130 - 138
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩. দেবী, মহাশ্বেতা, *গল্পসমগ্র – দ্বিতীয় খণ্ড,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২, পৃ. ১৮০
৪. তদেব, পৃ. ১৮৮
৫. তদেব, পৃ. ১৮৮
৬. তদেব, পৃ. ১৮৯
৭. দেবী, মহাশ্বেতা, *গল্পসমগ্র – তৃতীয় খণ্ড,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২, পৃ. ২৩২
৮. তদেব, পৃ. ২৩৪
৯. তদেব, পৃ. ২২৫
১০. তদেব, পৃ. ২৩৭
১১. তদেব, পৃ. ২৩৭
১২. তদেব, পৃ. ২৯৮
১৩. তদেব, পৃ. ৩১০
১৪. তদেব, পৃ. ৪১
১৫. তদেব, পৃ. ৪৫
১৬. তদেব, পৃ. ৪৮
১৭. তদেব, পৃ. ৫২
১৮. তদেব, পৃ. ২৮৬
১৯. তদেব, পৃ. ২৮৭